বাপ্পাদিত্য

তুষের আগুন যেমন প্রথম ধিক-ধিক, শেষে হঠাৎ ধূ-ধূ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি গোহের পর থেকে রাজপুতদের উপর ভীলদের রাগ ক্রমে ক্রমে অল্পে-অল্পে বাড়তে বাড়তে একদিন দাউ-দাউ করে পাহাড়ে-পাহাড়ে, বনে-বনে দাবানলের মতো জ্বলে উঠল।

গোহের সুন্দর মুখ, অসীম দয়া, অটল সাহসের কথা মনে রেখে ভীলেরা আট-পুরুষ পর্যন্ত রাজপুত রাজাদের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিল। যদি কোনো রাজপুত রাজা শিকারে যেতে পথের ধারে কোনো ভীলের কালো গায়ে বল্লমের খোঁচায় রক্তপাত করে চলে যেতেন, তবে তার মনে পড়ত—'রাজা গোহ একদিন তাদেরই বংশের একজনকে বাঘের মুখের থেকে বাঁচিয়ে এনে নিজের হাতে তার বুকের রক্ত মুছে দিয়েছিলেন। যখন কোনো রাজকুমার কোনো-একদিন শখ করে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে তামাশা দেখতেন, তখন তাদের মনে পড়ত—এক বছর—'দুর্ভিক্ষের দিনে রাজা গোহ তাঁর প্রকাণ্ড রাজবাড়ি, পরিপূর্ণ ধানের গোলা আশ্রয়হীন দীনদুঃখী ভীল-প্রজাদের জন্য সারা বৎসর খুলে রেখেছিলেন। ভাগ্য-দোষে যুদ্ধে জয় না হলে যেদিন কোনো কাপুরুষ যুবরাজ বিশ্বাসঘাতক বলে সেনাপতিদের মাথা একটির পর একটি হাতির পায়ের তলায় চূর্ণ করে ফেলতেন, সেদিন সমস্ত ভীল-বাহিনী চক্ষের জল মুছে ভাবত— হায় রে হায়, মহারাজ গোহ ছিলেন, যিনি যুদ্ধের সময় ভায়ের মতো তাদের যত্ন করতেন, মায়ের মতো তাদের রক্ষা করতেন, বীরের মতো সকলের আগে চলতেন।

Scanned with CamScanner

এত অত্যাচার, এত অপমান, তবু সেই বিশ্বাসী ভীল-প্রজাদের সরলপ্রাণ আট-পুরুষ পর্যন্ত বিশ্বাসে, রাজভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল! কিন্তু যখন বাপ্পাদিত্যের পিতা নাগাদিত্য রাজসিংহাসনে বসে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করলেন; যখন গরীব প্রজাদের গ্রাম জ্বালিয়ে, খেত উজাড় করে তাঁর মন সন্তুষ্ট হল না; তিনি যখন হাজার-হাজার ভীলের মেয়ে দাসীর মতো রাজপুতের ঘরে-ঘরে বিলিয়ে দিতে লাগলেন, যখন প্রতিদিন নতুন-নতুন অত্যাচার না হলে তাঁর ঘুম হতো না, শেষে সমস্ত ভীলের প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাদের একমাত্র আমোদ—বনে-বনে পশু শিকার—যেদিন নাগাদিত্য নতুন আইন করে একেবারে বন্ধ করলেন, সেদিন তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল।

নাগাদিত্য ভীল-প্রজাদের উপর এই নতুন আইন জারি করে সমস্ত রাত্রি সুখের স্বপ্নে কাটিয়ে সকালে উঠে দেখলেন, দিনটা বেশ মেঘলা মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে, কোনোদিকে ধুলো নেই, শিকারের বেশ সুবিধা। নাগাদিত্য তৎক্ষণাৎ হাতি সাজিয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সেদিন রাজার সঙ্গে কেবল রাজপুত। দলের পর দল, বড়ো বড়ো ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত। সামান্য ভীলের একটি ছোটো ছেলের পর্যন্ত যাবার হুকুম নেই! শিকার দেখলে খাঁচার ভিতরে চিতাবাঘ যেমন ছটফট করে আজ শিকারের দিনে ঘরের ভিতর বসে থেকে ভীলদের প্রাণ তেমনই ছটফট করছে— এই কথা ভেবে নিষ্ঠুর নাগাদিত্যের মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

মহারাজ নাগাদিত্য দলবল নিয়ে ভেরি বাজিয়ে হৈ-হৈ শব্দে পর্বতের শিখরে চড়লেন। বজ্রের মতো ভয়ংকর সেই ভেরির আওয়াজ শুনে অন্যদিন মহিষের পাল জল ছেড়ে পালাত, বনের পাখি বাসা ছেড়ে আকাশে উঠত, হাজার-

Scanned with CamScanner

হাজার হরিণ প্রাণ-ভয়ে পথ ভুলে ছুটতে ছুটতে যেখানে শিকারী সেইখানে এসে উপস্থিত হত, ঘুমন্ত সিংহ জেগে উঠত, বাঘ হাঁকার দিত— শিকারীরা কেউ বল্লম-হাতে মহিষের পিছনে, কেউ খাঁড়া-হাতে সিংহের সন্ধানে ছুটে চলত; কিন্তু নাগাদিত্য আজ বারবার ভেরি বাজালেন, বারবার শিকারীর দল চিৎকার করে উঠল, তবু সেই প্রকাণ্ড বনে একটিও বাঘের গর্জন, একটিও পাখির ঝটাপট কিংবা হরিণের ক্ষুরের খুটখাট শোনা গেল না— মনে হল, সমস্ত পাহাড় যেন ঘুমিয়ে আছে! রাগে নাগাদিত্যের দুই চক্ষু লাল হয়ে উঠল। তিনি দলবলের দিকে ফিরে বললেন— 'ঘোড়া ফেরাও। অসন্তুষ্ট ভীল-প্রজা এ বনের সমস্ত পশু অন্য পাহাড়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। চল, আজ গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে পশুর সমান ভীলের দল শিকার করিগে।'

মহারাজার রাজহস্তি শুঁড় দুলিয়ে কান কাঁপিয়ে পাহাড়ের উপর ইদরপুরের দিকে ফিরে দাঁড়াল— তার পিঠের উপর সোনার হাওদা, জরির বিছানা হীরের মতো জ্বলে উঠল, তার চারদিকে ঘোড়ায়-চড়া রাজপুতের দুশো বল্লম সকালের আলোয় ঝকমক করতে লাগল! নাগাদিত্য হুকুম দিলেন— 'চালাও!' তখন কোথা থেকে গভীর গর্জনে, সমস্ত পাহাড় যেন ফাটিয়ে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা কালো বাঘ, যেন একজন ভীল সেনাপতির মতো, সেই অত্যাচারী রাজার পথ আগলে পাহাড়ের সুঁড়ি পথে রাজহস্তির সম্মুখে এসে দাঁড়াল! নাগাদিত্য মহা আনন্দে ডান হাতে বল্লম নিয়ে হাতির পিঠে ঝুঁকে বসলেন। কিন্তু তাঁর হাতের বল্লম হাতেই রইল— 'বনের অন্ধকার থেকে কালো চামরে সাজানো প্রকাণ্ড একটা তীর তাঁর বুকের একদিক থেকে আর-একদিক ফাটিয়ে দিয়ে শনশন শব্দে বেরিয়ে গেল! অত্যাচারী নাগাদিত্য ভীলদের হাতে প্রাণ হারালেন। তারপর চারিদিক থেকে

Scanned with CamScanner

হাজার হাজার কালো বাঘের মতো কালো-কালো ভীল ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাজপুতদের রক্তে পাহাড়ের গা রাঙা করে তুললে; একজনও রাজপুত বেঁচে রইল না, কেবল সোনার সাজ-পরা মহারাজ নাগাদিত্যের কালো একটা পাহাড়ী ঘোড়া অন্ধকার সমুদ্রের সমান ভীল-সৈন্যের মাঝ দিয়ে ঝড়ের মতো রাজবাড়ির দিকে বেরিয়ে গেল।

রাজমহিষী তখন ইদরপুরে কেল্লার ছাদে রাজকুমার বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সন্ধ্যার হাওয়ায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, আর এক-একবার যে পাহাড়ে মহারাজ শিকারে গিয়েছেন, সেইদিকে চেয়ে দেখছিলেন এক সময় হঠাৎ পাহাড়ের দিকে একটা গোলমাল উঠল, তারপর রানী দেখলেন, সেই পাহাড়ে-রাস্তায়, বনের অন্ধকার থেকে, মহারাজের কালো ঘোড়াটি তীরের মতো ছুটে বেরিয়ে ঝড়ের মতো কেল্লার দিকে ছুটে আসতে লাগল— পিছনে তার শত-শত ভীল— কারো হাতে বল্লম, কারো হাতে বা তীর ধনুক। মহারানী দেখলেন, কালো ঘোড়ার মুখ থেকে শাদা ফেনা চারিদিকে মুক্তোর মতো ঝরে পড়ছে, তার বুকের মাঝ থেকে রক্তের ধারা রাস্তার ধুলোয় ছড়িয়ে যাচ্ছে, তারপর দেখলেন, আগুনের মতো একটি তীর তার কালো-চুলের ভিতর দিয়ে ধনুকের মতো তার সুন্দর বাঁকা ঘাড় সজোরে বিঁধে ঘোড়াটিকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেলল; রাজার ঘোড়া কেল্লার দিকে মুখ ফিরিয়ে ধুলোর উপর ধড়ফড় করতে লাগল। ঠিক সেই সময় মহারানীর মাথার উপর দিয়ে একটা বল্লম শনশন শব্দে কেল্লার ছাদের উপর এসে পড়ল। রাজমহিষী ঘুমন্ত বাপ্পাকে ওড়নার আড়ালে ঢেকে তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এলেন। চারিদিকে অস্ত্রের ঝনঝনি আর যুদ্ধের চিৎকার উঠল— সূর্যদেব মালিয়া পাহাড়ের পশ্চিম পারে অস্ত গেলেন।

Scanned with CamScanner

সে রাত্রি কী ভয়ানক রাত্রি। সেই মালিয়া-পাহাড়ের উপর অসংখ্য ভীল, আর মাঝে গুটিকতক রাজপুত প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন; আর অন্ধকার রাজপুরে নাগাদিত্যের বিধবা মহিষী পাঁচ বৎসরের রাজকুমার বাপ্পাকে বুকে নিয়ে নির্জন ঘরে বসে রইলেন! তিনি কতবার কত দাসীর নাম ধরে ডাকলেন— কারো সাড়া-শব্দ নেই। মহারাজের খবর জানবার জন্য তিনি কতবার কত প্রহরীকে চিৎকার করে ডাকলেন, কিন্তু তারা সকলেই যুদ্ধে ব্যস্ত, মহারানীর ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল, তবু তাঁর কথায় কর্ণপাতও করলে না! রানী তখন আকুল হৃদয়ে কোলের বাপ্পাকে ছোটো একখানি উটের কম্বলে ঢেকে নিয়ে অন্দরমহলের চন্দনকাঠের প্রকাণ্ড দরজা সোনার চাবি দিয়ে খুলে বাইরে উঁকি মেরে দেখলেন— রাত্রি অন্ধকার, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের খিলান, তার মাঝে গজদন্তের কাজ করা বড়ো-বড়ো দরজা খোলা— হাঁ-হাঁ করছে; অত বড়ো রাজপুরী যেন জনমানব নেই।

মহারানী অবাক হয়ে এক-হাতে বাপ্পাকে বুকে ধরে আর হাতে সোনার চাবির গোছা নিয়ে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল; চামড়ার জুতো পরা রাজপুত বীরের মচমচ পায়ের শব্দ নয়; রুপোর বাঁকি পরা রাজদাসীর ঝিনিঝিনি পায়ের শব্দ নয়, কাঠের খড়ম-পড়া পঁচাত্তর বৎসরের বুড়ো রাজপুরোহিতের খটাখট পায়ের শব্দ নয়— এ যেন চোরের মতো, সাপের মতো খুসখাস, খিটখাট পায়ের শব্দ! মহারানী ভয় পেলেন। দেখতে-দেখতে অসুরের মতো একজন ভীল-সর্দার তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল! মহারানী জিজ্ঞাসা করলেন— 'কে তুই? কী চাস?' ভীল সর্দার বাঘের মতো গর্জন করে বললে— 'জানিসনে আমি কে? আমি সেই দুঃখী ভীল, যার মেয়েকে তোর

Scanned with CamScanner

মহারাজা দাসীর মতো চিতোরের রাজাকে দিয়ে দিয়েছে। আজ কি সুখের দিন। এই হাতে নাগাদিত্যের বুকে বল্লম বসিয়েছি, আর এই হাতে তার ছেলেসুদ্ধ মহারানীকে দাসীর মতো বেঁধে নিয়ে যাব।' মহারানীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। 'ভগবান রক্ষা কর।' বলে তিনি সেই নীরেট সোনার বড়ো-বড়ো চাবির গোছা সজোরে ভীল-সর্দারের কপালে ছুঁড়ে মারলেন। দুরন্ত ভীল 'মা রে!' বলে চিৎকার করে ঘুরে পড়ল; মহারানী কচি বাপ্পাকে বুকে ধরে রাজপুরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন— তাঁর প্রাণের আধখানা মহারাজ নাগাদিত্যের জন্য হাহাকার করতে লাগল, আর আধখানা এই মহাবিপদে প্রাণের বাপ্পাকে রক্ষা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

রানী পথ চলতে লাগলেন— পাথরে পা কেটে গেল, শীতে হাত জমে গেল, অন্ধকারে বারবার পথ ভুল হতে লাগল— তবু রানী পথ চললেন। কত দূর! কত দূর!— পাহাড়ের পথ কত দূর? কোথায় চলে গেছে, তার যেন শেষ নেই। রানী কত পথ চললেন, তবু সে পথের শেষ নেই! ক্রমে ভোর হয়ে গেল, রাস্তার আশে-পাশে বীরনগরের দু-একটি ব্রাহ্মণের বাড়ি দেখা দিতে লাগল। পাহাড়ী হাওয়া বরফের মতো ঠাণ্ডা পাখিরাও তখন জাগেনি, এমন সময় নাগাদিত্যের মহিষী রাজপুত্র বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সেই বীরনগরের ব্রাহ্মণী কমলাবতীর বাড়ির দরজায় ঘা দিলেন। আটপুরুষ আগে, একদিন শিলাদিত্যের মহিষী পুষ্পবতী প্রাণের কুমার গোহকে এই বীরনগরের কমলাবতীর হাতে সঁপে গিয়েছিলেন। আর আজ আবার কতকাল পরে সেই কমলাবতীর নাতির নাতি বৃদ্ধ রাজপুরোহিতের হাতে গোহর বংশের গিহ্লোট-রাজকুমার বাপ্পাকে সঁপে দিয়ে নাগাদিত্যের মহিষী চিতার আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সকালে বৃদ্ধ পুরোহিত রাজপুত্রকে আশ্রয় দিলেন, আর সেইদিন সন্ধ্যার সময় একটি ভীলের মেয়ে ছোটো-ছোটো দুটি ছেলে কোলে তাঁরই ঘরে আশ্রয় নিলে। এদের পূর্বপুরুষ সর্বপ্রথমে নিজের আঙুল কেটে রাজপুত গোহের কপালে রক্তের রাজ তিলক টেনে দিয়েছিল—আজ রাজপুত রাজার সঙ্গে তাদেরও সর্বনাশ হয়ে, বিদ্রোহী ভীলেরা তাদের ঘর দুয়োর জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের তিনটিকে

Scanned with CamScanner

পাহাড়ের উপর থেকে দূর করে দিলে। রাজপুরোহিত সেই তিনটি ভীল আর রাজকুমার বাপ্পাকে নিয়ে বীরনগর ছেড়ে ভাণ্ডীরের কেল্লায় যদুবংশের আর এক ভীলের রাজত্বে কিছুদিন কাটালেন। কিন্তু সেখানেও ভীল রাজা; সেখানেও ভয় ছিল— কোন দিন কোন ভীল মা-হারা বাপ্পাকে খুন করে। ব্রাহ্মণ যে মহারানীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, বিপদে-সম্পদে অনাথ বাপ্পাকে রক্ষা করবেন। তিনি একেবারে ভীল রাজত্ব ছেড়ে তাদের কটিকে নিয়ে নগেন্দ্রনগরে চলে গেলেন। একদিকে সমুদ্রের তিনটে ঢেউয়ের মতো ত্রিকূট পাহাড়, আর একদিকে মেঘের মতো অন্ধকার পরাশর অরণ্য, মাঝখানে নগেন্দ্রনগর, কাছাকাছি শোলাঙ্কি বংশের একজন রাজপুত রাজার রাজবাড়ি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই নগেন্দ্রনগরে ব্রাহ্মণ-পাড়ার গা ঘেঁষে ঘর বাঁধলেন। সেই ভীলের মেয়ে তাঁর ঘরের সমস্ত কাজ করতে লাগল, আর রাজপুত্র বাপ্পা সেই দুটি ভাই— ভীল বালিয় ও দেবকে নিয়ে মাঠে-মাঠে বনে-বনে গরু চরিয়ে রাখাল-বালকদের সঙ্গে রাখালের মতো খেলে বেড়াতে লাগলেন। রাজপুরোহিত কারো কাছে প্রকাশ করলেন না যে, বাপ্পা রাজার ছেলে; কেবল একটি তামার কবচে আগাগোড়া সমস্ত পরিচয় নিজের হাতে লিখে বাপ্পার গলায় বেঁধে দিলেন— তাঁর মনে বড়ো ভয় ছিল পাছে কোনো ভীল বাপ্পার সন্ধান পায়।

ক্রমে বাপ্পা যখন বড়ো হয়ে উঠলেন; যখন মাঠে-মাঠে খোলা হাওয়ায় ছুটোছুটি করে, পাহাড়ে-পাহাড়ে ওঠা-নামাতে রাজপুত্র বাপ্পার সুন্দর শরীর দিন-দিন লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠল; যখন তিনি ক্ষেপা মোষ এক হাতে ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন; সমস্ত রাখাল-বালক যখন রাজপুত্র বলে না জেনেও রাজার মতো বাপ্পাকে ভয়, ভক্তি, সেবা করতে লাগল তখন ব্রাহ্মণ অনেকটা নিশ্চিন্ত

Scanned with CamScanner

হলেন। তখন তিনি বাপ্পার শরীরের সঙ্গে মনকেও গড়ে তুলতে লাগলেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একলা ঘরে বাপ্পার কাছে বসে সেই মালিয়া পাহাড়ের গল্প, সেই ভীল-বিদ্রোহের গল্প, সেই রানী পুষ্পবতী, মহারাজ শিলাদিত্য, রাজকুমার গোহ, তাঁর প্রিয়বন্ধু মাণ্ডলিকের কথা একে-একে বলতে লাগলেন। শুনতে-শুনতে কখনো বাপ্পার চোখে জল আসত, কখনো বা রাগে মুখ লাল হয়ে উঠত, কখনো ভয়ে প্রাণ কাঁপত। বাপ্পা সারা-রাত্রি কখনো সূর্যের মন্ত্র, কখনো পাহাড়ের ভীলের যুদ্ধ, স্বপ্নে দেখে জেগে উঠতেন, মনে ভাবতেন— আমিও কবে হয়তো রাজা হব, লড়াই করবো।

এমনিভাবে দিন কাটছিল। সে সময় একদিন শ্রাবণ মাসে নতুন-নতুন ঘাসের উপর গরুগুলি চরতে দিয়ে বনের পথে বাপ্পাদিত্য একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সেদিন ঝুলন-পর্ব, রাজপুতদের বড়ো আনন্দের দিন; সকাল না হতে দলে দলে রাখাল নুতন কাপড় পরে, কেউ ছোট ভাইবোনকে কোলে করে, কেউ বা দইয়ের ভার কাঁধে নিয়ে, একজন তামাশা দেখতে অন্যজন বা পয়সা করতে, নগেন্দ্র-নগরের রাজপুত-রাজার বাড়ির দিকে মেলা দেখতে ছুটল। বাপ্পা প্রকাণ্ড বনে একলা রইলেন; তাঁর প্রাণের বন্ধু, দুটি ভাই— ভীল বালিয় আর দেব, দিদির হাত ধরে এই আনন্দের দিনে বাপ্পাকে কতবার ডাকল— ‘ভাই, তুই কি রাজবাড়ি যাবি?’ বাপ্পা শুধু ঘাড় নাড়লেন— ‘না, যাব না।’ হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল— আমার ভাই নেই, বোন নেই, মা নেই, আমি কার হাত ধরে কাকে নিয়ে আজ কিসের আনন্দে মেলা দেখতে যাব? কিন্তু যখন বালিয় আর দেব ভীলনীদিদির সঙ্গে-সঙ্গে হাসতে-হাসতে চলে গেল, যখন সকালের রোদ মেঘের আড়ালে ঢেকে গেল, বাপ্পার একটি মাত্র গাই চরতে-চরতে যখন মাঠের পর মাঠ

Scanned with CamScanner

পার হয়ে বনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, যখন বনে আর সাড়া শব্দ নেই, কেবল মাঝে-মাঝে ঝিঁঝির ঝিনিঝিনি, পাতার ঝুরুঝুরু, সেই সময় বাপ্পার বড়োই একা একা ঠেকতে লাগল। তিনি উদাস প্রাণে ভীলনীদিদির মুখে শোনা ভীল রাজত্বের একটি পাহাড়ী গান, ছোটো একটি বাঁশের বাঁশিতে বাজাতে লাগলেন। সেই গানের কথা বোঝা গেল না, কেবল ঘুমপাড়ানি গানের মতো তার বুনো সুরটা মেঘলা দিনে বাদলা হাওয়ায় মিশে স্বপনের মতো বাপ্পার চারিদিকে ভেসে বেড়াতে লাগল! আজ যেন তাঁর মনে পড়তে লাগল— ঐ পশ্চিমের দিকে, যেখানে মেঘের কোলে সূর্যের আলো ঝিকিমিকি জ্বলছে, যেখানে কালো কালো মেঘ পাথরের মতো জমাট বেঁধে রয়েছে, সেইখানে সেই অন্ধকার আকাশের নিচে, তাঁদের যেন বাড়ি ছিল; সেই বাড়ির ছাদে চাঁদের আলোয় তিনি মায়ের হাত ধরে বেড়িয়ে বেড়াতেন; সে বাড়ি কী সুন্দর! সে চাঁদের কী চমৎকার আলো! মায়ের কেমন হাসিমুখ! সেখানে সবুজ ঘাসে হরিণছানা চরে বেড়াত; গাছের উপরে টিয়ে পাখি উড়ে বসত; পাহাড়ের গায়ে ফুলের গোছা ফুটে থাকত— তাদের কী সুন্দর রঙ, কী সুন্দর গলা! বাপ্পা সজল নয়নে মেঘের দিকে চেয়ে-চেয়ে বাঁশের বাঁশিতে ভীলের গান বাজাতে লাগলেন— বাঁশির করুণ সুর কেঁদে-কেঁদে, কেঁপে-কেঁপে বন থেকে বনে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সেই বনের একধারে আজ ঝুলন-পূর্ণিমায় আনন্দের দিনে, শোলাঙ্কিবংশের রাজার মেয়ে সখীদের নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছিলেন। রাজকুমারী বললেন— 'শুনেছিস ভাই, বনের ভিতর রাখাল-রাজা বাঁশি বাজাচ্ছে!' সখীরা বললে— 'আয় ভাই, সকলে মিলে চাঁপা গাছে দোলা খাটিয়ে ঝুল্‌নো-খেলা খেলি আয়!' কিন্তু দোলা খাটাবার দড়ি নেই যে! সেই বৃন্দাবনের মতো গহন বন, সেই

Scanned with CamScanner

বাদল দিনের গরু গর্জন, সেই দূরে বনে রাখাল রাজের মধুর বাঁশি, সেই সখীদের মাঝে শ্রীরাধার সমান রূপবতী রাজনন্দিনী, সবই আজ যুগযুগান্তরের আগেকার বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-রাধার প্রথম ঝুলনের মতো! এমন দিন কি ঝুলনা বাঁধার একগাছি দড়ির অভাবে বৃথা যাবে? রাজনন্দিনী গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। আবার সেই বাঁশি, পাখির গানের মতো, বনের এপার থেকে ওপার আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে বেজে উঠল! রাজকুমারী তখন হীরে-জড়ানো হাতের বালা সখীর হাতে দিয়ে বললেন— 'যা ভাই, এই বালার বদলে ঐ রাখালের কাছ থেকে একগাছা দড়ি নিয়ে আয়।'

রাজকুমারীর সখী সেই বালা-হাতে বাপ্পার কাছে এসে বললে— 'এই বালার বদলে রাজকুমারীকে একগাছা দড়ি দিতে পার?' হাসতে হাসতে বাপ্পা বললেন— 'পারি, যদি রাজকুমারী আমায় বিয়ে করে!'

সেই দিন সেই নির্জন বনে, রাজকুমারীর হাতে সেই হীরের বালা পরিয়ে দিয়ে রাজকুমার বাপ্পা চাঁপাগাছে ঝুলনা বেঁধে নিয়ে রাজকন্যার হাত ধরে বসলেন। চারিদিকে যত সখী দোলার উপর বর-কনেতে ঘিরে-ঘিরে ঝুলনের গান গেয়ে ফিরতে লাগল— 'আজ কী আনন্দ! আজ কী আনন্দ!' খেলা শেষ হলো, সন্ধ্যা হলো, রাজকুমারী বনের রাখালকে বিয়ে করে রাজবাড়িতে ফিরে গেলেন; আর বাপ্পা ফুলে-ফুলে প্রফুল্ল চাঁপার তলায় বসে ঝুলন-পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন— আজ কী আনন্দ!

হঠাৎ একটুখানি পুবের হাওয়া গাছের পাতা কাঁপিয়ে ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে হু-হু শব্দে পশ্চিমদিকে চলে গেল। সেই সঙ্গে বড়ো-বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা টুপটাপ করে চাঁপাগাছের সবুজ পাতার উপরে ঝরে পড়ল। বাপ্পা আকাশের দিকে চেয়ে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দেখলেন— পশ্চিমদিক থেকে একখানা কালো মেঘ ক্রমশ পূর্বদিকে এগিয়ে চলেছে— মাঝে-মাঝে গুরু গুরু গর্জন আর ঝিকিমিকি বিদ্যুৎ হানছে। বাপ্পা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন, মনে পড়ল, ঘরে ফিরতে হবে। দুধের মতো শাদা তাঁর ধবলী গাই বনের মাঝে ছাড়া আছে। তিনি চাঁপাগাছ থেকে ছাদন খুলে নিয়ে ধবলী গাইটির সন্ধানে চললেন। তখন চারিদিকে অন্ধকার, মাঝে-মাঝে গাছে-গাছে রাশি-রাশি জোনাকি-পোকা হীরের মতো ঝকঝক করছে, আর জায়গায়-জায়গায় ভিজে মাটির নরম গন্ধ বনস্থল পরিপূর্ণ করছে। বাপ্পা সেই অন্ধকার বনের পথে-পথে ধবলীর সন্ধানে ফিরতে লাগলেন। হঠাৎ এক জায়গায়, ঘন বেতের বনের আড়ালে বাপ্পা দেখলেন— এক তেজোময় ঋষি ধ্যানে বসে আছেন; ঠিক তাঁর সম্মুখে মহাদেবের নন্দীর মতো তাঁর ধবলী গাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই শাদা গাইয়ের গাঢ় দুধ সুধার মতো একটি শ্বেতপাথরের শিবের মাথায় আপনা-আপনি ঝরে পড়ছে। বাপ্পা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ক্রমে ধ্যানভঙ্গে মহর্ষির দুটি চোখ সকাল-বেলায় পদ্মের পাপড়ির মতো ধীরে-ধীরে খুলে গেল। মহর্ষি মহাদেবকে প্রণাম করে এক অঞ্জলি দুধের ধারা পান করলেন। তারপর বাপ্পার দিকে ফিরে বললেন— ‘শোনো বৎস, আমি মহর্ষি হারীত। তোমায় আশীর্বাদ করছি— তুমি দীর্ঘজীবী হও, পৃথিবীর রাজা হও। তোমার ধবলীর দুধের ধারায় আজ আমি বড়োই তুষ্ট হয়েছি। আজ আমার মহাপ্রস্থানের দিন, এই শেষদিনে তোমায় আর কী দেব? এই ভগবতী ভবানীর খাঁড়া, এই অক্ষয় ধনুঃশর— এই খাঁড়া পাহাড়ও বিদীর্ণ করে, এই ধনুঃশর পৃথিবী জয় করে দেয়— এই দুটি তুমি লও। আর বৎস, ভগবান একলিঙ্গের এই শ্বেতপাথরের মূর্তিটি সঙ্গে রেখ, সর্বদা এঁর পূজা করবে। আজ হতে তোমার নাম

Scanned with CamScanner

হল— একলিঙ্গকা দেওয়ান। তোমার বংশে যত রাজা, এই নামেই সিংহাসনে বসবে।' তারপর নিজের হাতে বাপ্পার গলায় চামড়ার পৈতা জড়িয়ে দিয়ে মহর্ষি সমাধিতে বসলেন। দেখতে দেখতে তাঁর পবিত্র শরীর আগুনের মতো ধূ-ধূ করে জ্বলে গেল। বাপ্পা কোমরে খাঁড়া, হাতে ধনুঃশর, মাথায় একলিঙ্গের মূর্তি ধরে ধবলী গাইয়ের পিছনে পিছনে ফিরে চললেন— মেঘের গুরু-গুরু দেবতার দুন্দুভির মতো, সমস্ত আকাশজুড়ে বাজতে লাগল।

তখন ভোর হয়ে এসেছে, মেলা শেষে মলিন মুখ যে যার ঘরে ফিরছে, বাপ্পা সেই যাত্রীদের সঙ্গে ঘরে ফিরলেন।

কিছুদিন পরেই বাপ্পাকে নগেন্দ্রনগর ছেড়ে যেতে হল। ঝুলন-পূর্ণিমার খেলাচ্ছলে দুজনে বিয়ে হবার পর বিদেশ থেকে রাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এক ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হলেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা নগেন্দ্রনগরে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে ব্রাহ্মণ রাজকন্যার হাত দেখে গুণে বলেছেন আগেই নাকি কোন বিদেশীর সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হয়ে গেছে। আজ রাজার গুপ্তচর সেই বিদেশীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে— রাজা তার মাথা আনতে হুকুম দিয়েছেন। কথাটা শুনে বাপ্পার মন অস্থির হয়ে উঠল, ভাবনায়-ভাবনায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে ভোরে উঠে তিনি দেশ ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। যাবার সময় বাপ্পা তাঁর পালক-পিতা পঁচাশি বৎসরের সেই রাজপুরোহিতের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করে বললেন— 'পিতা, আমায় বিদায় দাও। আমি তো এখন বড়ো হয়েছি আমার জন্যে তোমরা কেন বিপদে পড়? ব্রাহ্মণ বললেন— 'বৎস, তুমি জানো না তুমি কে; তুমি রাজপুত্র, তোমার মা তোমাকে আমার হাতে সঁপে গেছেন; আমি আজ এই অল্প-বয়সে একা ভিখারীর মতো তোমাকে কেমন করে বিদায় করব?' বাপ্পা তখন ভগবতীর

Scanned with CamScanner

সেই খাঁড়া আর অক্ষয় ধনুঃশর দেখিয়ে বললেন— 'পিতা, বিদেশে এরাই আমার সহায়, আর আছেন একলিঙ্গজী;' ব্রাহ্মণ তখন আনন্দে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন— 'যাও বৎস, তুমি রাজার ছেলে, রাজারই মতো ধনুঃশর হাতে পেয়েছ! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করছি— পৃথিবীর রাজ হও। যদি কেউ তোমার পরিচয় চায়, তবে গলার কবচ খুলে দেখিয়ে দিও কোন পবিত্র বংশে তোমার জন্ম, তোমার পূর্বপুরুষেরা কোন রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করে গেছেন। যাও বৎস, সুখে থাক!'

ব্রাহ্মণের কাছে বিদায় হয়ে বাপ্পা ভীলনীদিদির কাছে বিদায় নিতে চললেন কিন্তু সেখানে বিদায় নেওয়া ততোটা সহজ হল না। অনেক কাঁদাকাটার পর ভীলনীদিদি বললেন— 'বাপ্পা রে, যদি যাবি তবে তোর দুই ভাই— বালিয় ও দেবকে সাথে নে। ওরে বাপ্পা, তোকে একা ছেড়ে দিতে প্রাণ আমার কেমন কেমন করে যে!' তারপর তিনজনের হাতে তিন-তিনখানি পোড়া রুটি দিয়ে ভীলনীদিদি তিনটি ভাইকে বিদায় করলেন। বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে বাপ্পা গহন বনে চলে গেলেন। সেখানে বড়ো-বড়ো পাথরের থামের মতো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, কোথাও ময়ূর-ময়ূরী বন আলো করে উড়ে বেড়াচ্ছে; কোথাও আস্ত ছাগল গিলে প্রকাণ্ড একটা অজগর স্থির হয়ে পড়ে; কোথাও বাঘের গর্জন, কোথাও বা পাখির গান; এক জায়গায় সবুজ ঘাসে সোনার রোদ, তার-জায়গায় কাজলের সমান নীল অন্ধকার। বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে বাপ্পা কখনো বনের মনোহর শোভা দেখতে দেখতে কখনো মহা-মহা বিপদের মাঝখান দিয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া হাতে নির্ভয়ে চললেন।

Scanned with CamScanner

সেই প্রকাণ্ড পরাশর অরণ্য পার হতে তাঁর তিন দিন, তিন রাত কেটে গেল, রাজপুত্র বাপ্পা সেই তিন দিন তিনখানি পোড়া রুটি খেয়ে কাটিয়ে দিলেন। তারপর গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ পার হয়ে, কত বর্ষা, কত শীত, পথে-পথে কাটিয়ে, বাপ্পা মেবারের মৌর্যবংশীয় রাজা মানের রাজধানী চিতোর নগরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের মহা আয়োজন হচ্ছে। হাতির পিঠে, উটের উপরে গোলাগুলি চাল-ডাল, তাম্বু-কানাত; গরুর গাড়িতে অস্ত্র-শস্ত্র, খাবার-দাবার; বড়ো-বড়ো জালায় খাবার জল রাঁধবার ঘি তোলা হচ্ছে; রাস্তায় রাস্তায় রাজপুত সৈন্য মাথায় পাগড়ি, হাতে বল্লম ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে রাজার চর মুসলমানের সন্ধানে-সন্ধানে ফিরছে। মহারাজ মান নিজে সামন্ত-রাজাদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন দেখে বেড়াচ্ছেন— চারদিকে হৈ-হৈ পড়ে গেছে।

এত গোলমাল, এত লোকজন, এমন প্রকাণ্ড নগর, এত বড়ো-বড়ো পাথরের বাড়ি বাপ্পা এ পর্যন্ত কখনো দেখেননি। নগেন্দ্রনগরে বাড়ি ছিল বটে কিন্তু তার মাটির দেয়াল; সেখানেও মন্দির ছিল, কিন্তু সে কত ছোটো! বাপ্পা আশ্চর্য হয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন, বালিয় আর দেব বড়ো-বড়ো হাতি দেখে অবাক হয়ে হাঁ করে রইল। সেই সময়ে রাজা মান ঘোড়ায় চড়ে সেই রাস্তায় উপস্থিত হলেন; শাদা ঘোড়ার সোনার সাজ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, মাথায় রাজছত্র ঝলমল করছে, দুইদিকে দুইজন ময়ূর-পাখার চামর দোলাচ্ছে। বাপ্পা ভাবলেন— রাজার সঙ্গে দেখা করবার এই ঠিক সময়। তিনি তৎক্ষণাৎ বালিয় ও দেবের হাত ধরে রাস্তার মাঝে উপস্থিত হয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া কপালে স্পর্শ করে মহারাজকে প্রণাম করলেন। রাজা মান জিজ্ঞাসা করলেন— 'কে তুমি

Scanned with CamScanner

কী চাও?' বাপ্পা বললেন— 'আমি রাজপুত রাজার ছেলে, আপনার আশ্রয়ে রাজার মতো থাকতে চাই!' এই ভিখারী আবার রাজার ছেলে! চারিদিকে বড়ো-বড়ো সর্দার মুখ টিপে হাসতে লাগলেন, কিন্তু রাজা মান বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর, সুন্দর মুখ, অক্ষয় ধনুঃশর আর সেই ভবানীর খাঁড়া দেখেই বুঝেছিলেন— এ কোনো ভাগ্যবান, ভগবান কৃপা করে এই মুসলমান যুদ্ধের সময় এই বীরপুরুষকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। মানরাজা তৎক্ষণাৎ নিজের জরির শাল বাপ্পার গায়ে পরিয়ে দিয়ে একটা কালো ঘোড়া বাপ্পার জন্য আনিয়ে দিলেন। বাপ্পা বললেন— 'মহারাজ, আমার ভীল ভাইদের জন্যে ঘোড়া আনিয়ে দিন!' তারপর, বালিয় ও দেবকে ঘোড়ায় চড়িয়ে বাপ্পা সেই কালো ঘোড়ায় উঠে বসলেন— সমস্ত সৈন্যসামন্ত ও সেনাপতির মাথার উপর বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর, সমুদ্রের মাঝে পাহাড়ের মতো, প্রায় আধখানা জেগে রইল; তখন রাস্তার লোক দেখে বলতে লাগল— 'হ্যাঁ, বীর বটে; যেমন চেহারা, তেমনি শরীর! চারিদিকে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল; কেবল রাজার যত সেনাপতি মাথার উপরে রাজবেশ মোড়া সেই ভিখারীকে দেখে মান-রাজার উপর মনে-মনে অসন্তুষ্ট হলেন। রাজা দিন-দিন বাপ্পাকে যতই সুনয়নে দেখতে লাগলেন, যতই তাকে আদর অভ্যর্থনা করতে লাগলেন, ততই সেনাপতিদের মন হিংসার আগুনে পুড়তে লাগল।

ক্রমে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের দিন উপস্থিত হল। সেইদিন রাজসভায় দেশ-বিদেশের যত সামন্ত-রাজা, যত বুড়ো-বুড়ো সেনাপতি একমত হয়ে মান-রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন— 'মহারাজ, আমরা অনেক সময় অনেক যুদ্ধে তোমার জন্য প্রাণ দিতে গিয়েছি, সে কেবল তুমি আমাদের ভালবাসতে বলে, আমাদের বিশ্বাস করতে বলে; যদি মহারাজ, আজ তুমি সেই ভালোবাসা ভুলে

Scanned with CamScanner

একজন পথের ভিখারীকে আমাদের সকলের উপরে বসালে, বাপ্পা আজ যদি তোমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সকলের চেয়ে বিশ্বাসী হল— তবে আমাদের আর কাজ কী? বাপ্পাকেই এই মুসলমান যুদ্ধে সেনাপতি কর; আমাদের বীরত্ব তো অনেকবার দেখা আছে, এবার নতুন সেনাপতি কেমন করে যুদ্ধ করেন দেখা যাক!' মহারাজ মান চিরবিশ্বাসী রাজভক্ত সর্দারদের মুখে হঠাৎ এই নিষ্ঠুর কথা শুনে বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তাঁর আর কথা বলবার শক্তি থাকল না। তখন সেই প্রকাণ্ড রাজসভায় এই বিদ্রোহী সর্দারদের মধ্যস্থলে পনেরো বৎসরের বীর-বালক বাপ্পাদিত্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শুনুন মহারাজ! আজ রাজস্থানের প্রধান-প্রধান সর্দারেরা রাজসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন— এ ঘোর বিপদের সময় বাপ্পাই এবার সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ চালান; তবে তাই হোক!' রাজা মান হতাশের মতো চারিদিকে চেয়ে দেখলেন; তারপর ধীরে-ধীরে বললেন— 'তবে তাই হোক।' তারপর একদিক দিয়ে মূর্ছিতপ্রায় মান-রাজা চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন; আর একদিক দিয়ে বাপ্পাদিত্য সৈন্য সাজাতে বাহির হলেন।

বিদ্রোহী-সর্দারদের মাথা হেঁট হলো। তাঁরা মনে ভেবেছিলেন যে, পনেরো বৎসরের বালক বাপ্পা যুদ্ধে যেতে কখনোই সাহস পাবে না— সভার মাঝে অপমান হবে; কিন্তু যখন সেই বীর-বালক নির্ভয়ে হাসিমুখে এই ভয়ংকর যুদ্ধের ভার রাজার কাছে চেয়ে নিলে, তখন তাঁদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁরা আরও আশ্চর্য হলেন, যখন সেই বাপ্পা— যাঁকে তাঁরা একদিন পথের ভিখারী বলে ঘৃণা করেছেন— পনেরো বৎসরের সেই বালক বাপ্পা— যুদ্ধ জয় করে কোটি-কোটি রাজপুত-প্রজার আশীর্বাদ, জয়জয়কারের মধ্যে একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে

Scanned with CamScanner

সমস্ত রাজস্থানের রাজমুকুটের সমান রাজপুতের রাজধানী চিতোর নগরে ফিরে এলেন। সেদিন সমস্ত রাজস্থান বেড়ে কী আনন্দ, কী উৎসাহ।

নতুন সেনাপতি বাপ্পা সমস্ত রাজস্থানকে ভয়ংকর মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করে যেদিন চিতোর নগরে ফিরে এলেন, সেদিন রাজা মানের বুড়ো-বুড়ো সর্দারেরা ক্ষুণ্ণ মনে রাজসভা ছেড়ে গেলেন। মহারাজ মান তাঁদের ফিরিয়ে আনতে কতবার চেষ্টা করলেন, কাকুতি-মিনতি, এমন কি শেষে রাজগুরুকে পর্যন্ত তাদের কাছে পাঠালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, সর্দারেরা দূতের মুখে বলে পাঠালেন— 'আমরা মহারাজের নিমক খেয়েছি, একবৎসর পর্যন্ত আমরা শত্রুতা করব না, বৎসর শেষ হলে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হবে।'

সেই এক বৎসর কত ভীষণ ষড়যন্ত্র কত ভয়ংকর পরামর্শে কেটে গেল। এক বৎসর পরে সেই বিদ্রোহী সর্দারের দুষ্ট পরামর্শে রাজা মানকে ভুল বুঝে বাপ্পা তাঁদের সকলের সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে চললেন। রাজা মান যখন শুনলেন বাপ্পা তাঁর রাজসিংহাসন কেড়ে নিতে আসছেন; যখন শুনলেন যে-বাপ্পাকে তিনি পথের ধুলো থেকে একদিন রাজসিংহাসনের দিকে তুলে নিয়েছিলেন, যার দীনহীন বেশ একদিন তিনি রাজবেশ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন, যাকে তিনি প্রাণের চেয়েও প্রিয় ভেবেছিলেন— হায় রে! সেই অনাথ আজ সমস্ত কৃতজ্ঞতা ভুলে তাঁরই রাজছত্র কেড়ে নিতে আসছে, তখন তাঁর দুই চক্ষে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল।

তিনি সেই বৃদ্ধ বয়সে একা একদল রাজভক্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে গেলেন; সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ; যুদ্ধক্ষেত্রে বাপ্পার হাতে মান-রাজা প্রাণ দিলেন।

Scanned with CamScanner

ষোলো বৎসরের বাপ্পা দেববন্দরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে হিন্দুমুকুট, হিন্দু-সূর্য, রাজগুরু, চাকুয়া উপাধি নিয়ে চিতোরের রাজসিংহাসনে বসলেন। বালিয় ও দেব দুটি ভাই ভীল, বাপ্পার কপালে রাজতিলক টেনে দিয়ে দুখানা গ্রাম বকশিশ পেলে। বাপ্পা সেদিন নিয়ম করে দিলেন যে, তাঁর বংশের যত রাজা সকলকেই এই দুই ভীলের বংশবাবলীর হাতে রাজটীকা নিয়ে সিংহাসনে বসতে হবে। আজও সেই নিয়ম চলে আসছে। এই নতুন নিয়ম বাপ্পা রাজস্থানে যখন প্রচলিত করলেন, তখন এই ভীলের হাতে রাজটীকা নেবার কথা যে শুনলে, সেই মনে ভাবলে নতুন রাজার এ একটা নতুন খেয়াল; কিন্তু মান রাজার সভাপণ্ডিতেরা ভাবলেন, ইনি কি তবে গিহ্লোট-রাজকুমার গোহের বংশীয়?— সূর্যবংশেই তো ভীলের হাতে রাজটীকা নেবার নিয়ম ছিল জানি! মহারাজ বাপ্পা নাগাদিত্যের মহিষী চিতোর-রাজকুমারীর ছেলে নয়তো? রাজা মান, বাপ্পার মায়ের ভাই মামা নয়তো? ছি! ছি! বাপ্পা কি অধর্ম করলেন— চোরের মতন মামার সিংহাসন আপনি নিলেন? এমন নিষ্ঠুর রাজার রাজত্বে থাকাও যে মহাপাপ? পণ্ডিতেরা আর রাজসভা মুখো হলেন না— একে-একে চিতোর ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। হায়, তাঁরা যদি জানতেন বাপ্পা কত নির্দোষ; বাপ্পা স্বপ্নেও ভাবেননি রাজা মান তাঁর মামা। তিনি তাঁর পালক পিতা সেই রাজপুরোহিতের কাছে ভীল-বিদ্রোহ, রাজা গোহ, গায়েব গায়েবীর গল্প শুনতেন বটে, কিন্তু তিনি জানতেন না, যার নিষ্ঠুর অত্যাচারে সরল ভীলেরা একদিন ক্ষেপে উঠেছিল, সেই মহারাজ নাগাদিত্য তাঁর পিতা; তিনি জানতেন না যে, তাঁরই পূর্বপুরুষ রাজকুমার গোহ, যাঁকে পুষ্পবতী ব্রাহ্মণী কমলাবতীর হাতে সঁপে দিয়ে চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। বাপ্পা ভাবতেন তিনি কোনো সামান্য রাজ্যের রাজপুত্র।

Scanned with CamScanner

রাজা হবার পর বাপ্পা যখন দেববন্দরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে ফিরে আসেন, তখন বাণমাতা দেবীর সোনার মূর্তি সঙ্গে এনেছিলেন। চিতোরের রাজপ্রাসাদে শ্বেত-পাথরের মন্দিরে সোনার সেই দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে প্রতিদিন দুই সন্ধ্যা পুজো করতেন।

অনেক দিন কেটে গেছে, বাপ্পা প্রায় বুড়ো হয়েছেন, সেই সময় একদিন ভক্তিভরে বাণমাতাকে প্রণাম করে উঠবার সময় বাপ্পার গলা থেকে ছেলেবেলার সেই তামার কবচ ছিঁড়ে পড়ল। বাপ্পা বড়ো হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু সূতোয় বাঁধা তামার কবচটি তাঁর গলায় যেমন, তেমনই ছিল— অনেকদিনের অভ্যাসে মনেই পড়ত না যে, গলায় একটা কিছু আছে। আজ যখন হীরামোতির কুড়িগাছা হারের নিচে থেকে সেই পুরোনো কবচখানি পায়ের তলায় ছিঁড়ে পড়ল, তখন বাপ্পা চমকে উঠে ভাবলেন, এ কী! এতদিন আমার মনেই ছিল না যে এতে লেখা আছে আমি কে, কোথায় ছিলুম! আজ সব সন্ধান পাওয়া যাবে! বাপ্পা প্রফুল্ল-মুখে সেই তামার কবচ মহারানীর হাতে এনে দিয়ে বললেন— 'পড় তো শুনি।' বাপ্পা নিজে এক অক্ষরও পড়তে জানতেন না। মহারানী বাপ্পার পায়ের কাছে বসে পড়তে লাগলেন। কবচের এক পিঠে লেখা রয়েছে— 'বাসস্থান ত্রিকূট পর্বত, নগেন্দ্রনগর, পরাশর-অরণ্য।' বাপ্পা হাসিমুখে রানীর কাঁধে হাত রেখে বললেন— 'এই আমার ছেলেবেলার দেশ, এইখানে কত খেলা খেলেছি! সেই ত্রিকূট পাহাড়, সেই আশি বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গম্ভীর মুখ, নগেন্দ্রনগরে ঝুলন পূর্ণিমায় সেই জ্যোৎস্না-রাত্রি, সেই শোলাঙ্কি-রাজকুমারীর মধুর হাসি, স্বপ্নের মতো আমার এখনো মনে আসে! আমি কতবার কত লোককে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু পৃথিবীতে তিনটে চুড়ো পাহাড় কত আছে, কে তার সন্ধান পাবে! আমি যদি বলতে পারতেম

Scanned with CamScanner

যে সেই মেঘের মতো তিনটে পাহাড়ের ঢেউকে 'ত্রিকূট' বলে, যদি বলতে পারতেম সেই ছোটো শহরের নাম নগেন্দ্রনগর, যদি জানতে পারতেম সেই ঘন বন, যেখানে আমি রাখালদের সঙ্গে খেলে বেড়াতাম, যেখানে ঝুলন-পূর্ণিমায় শোলাঙ্কি-রাজকুমারীকে বিয়ে করেছিলেন, সেটি পরাশর-অরণ্য, তবে কোনো গোলই হতো না; হায় হায়! জন্মাবধি লেখা-পড়া না শিখে এই ফল। এতকাল পরে কি আর সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সেই শোলাঙ্কি-রাজনন্দিনীকে ফিরে পাব? পড় তো শুনি আর কী লেখা আছে?' রানী কবচের আর-এক পিঠ উল্‌টে পড়তে লাগলেন— 'জন্মস্থান মালিয়া-পাহাড়, পিতানাগাদিত্য, মাতা চিতোর কুমারী, নাম বাপ্পা।'

মহারানীর বড়ো বড়ো চোখ মহাবিস্ময়ে আরও বড়ো হয়ে উঠল— তিনি তামার সেই কবচ হাতে বাপ্পার পায়ের তলায় ফুলের বিছানার মতো সুন্দর গালিচায় অবাক হয়ে বসে রইলেন; আর গজদন্তের পালঙ্কের উপর বাপ্পা ডান হাতের আঙুলে এক ফোঁটা রক্তের মতো বড়ো একখানা প্রবালের আঙ্‌টির দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন, হায়, হায়! কী পাপ করেছি! এই হাতে পিতৃহন্তা ভীলদের শাসন না করে, মামার প্রাণহন্তা হয়ে আমি সিংহাসনে বসেছি। 'মহারানী! আমি মহাপাপী, আমি চিতোরের সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত নই। এখন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ আর আত্মীয়-বধের প্রায়শ্চিত্ত আমার জীবনের ব্রত হল।'

একলিঙ্গের দেওয়ান বাপ্পা সেই দিনই সকলের কাছে বিদায় হয়ে, দশ হাজার দেওয়ানী ফৌজ নিয়ে চিতোর থেকে বের হলেন। তাঁর সমস্ত রাগ মালিয়া-পাহাড়ে ভীল রাজত্বের উপর গিয়ে পড়ল। বাপ্পা মারিয়া পাহাড় জয় করে, ভীল রাজত্ব ছারখার করে চলে গেলেন। তারপর দেশ-বিদেশ— কাশ্মীর, কাবুল,

Scanned with CamScanner

ইস্পাহান, কান্দাহার, ইরান, তুরান জয় করলেন। বাপ্পার সকল সাধ পূর্ণ হল; মালিয়া পাহাড় জয় করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধের সাধ পূর্ণ হল, আধখানা পৃথিবী চিতোর সিংহাসনের অধীনে এনে আত্মীয়বধের কষ্ট অনেকটা দূর হল, কিন্তু তবু মনের শান্তি প্রাণের আরাম কোথায় পেলেন? বাপ্পা যখন সমস্ত দিন যুদ্ধের পর শ্রান্ত হয়ে নিজের শিবিরে বসে থাকতেন, যখন নিস্তব্ধ যুদ্ধক্ষেত্র কোনো দিন পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় আলোময় হয়ে যেত, তখন বাপ্পার সেই ঝুলন-পূর্ণিমার রাত্রে চাঁপাগাছের ঝুলনায় শোলাঙ্কি-রাজকুমারীর হাসি-মুখ মনে পড়ত; যখন কোনো নতুন দেশ জয় করে বাপ্পা সেখানকার নতুন রাজপ্রাসাদে সোনার পালঙ্কে নহবতের মধুর সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন, তখন সেই পূর্ণিমার রাতে চাঁপাগাছের চারিদিকে ঘিরে-ঘিরে রাজকুমারীর সখীদের সেই ঝুলন-গান স্বপ্নের সঙ্গে বাপ্পার প্রাণে ভেসে আসত। শেষে যেদিন তিনি নগেন্দ্রনগরে গিয়ে দেখলেন তাঁদের পাতার কুটির মাটির দেওয়াল মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, যখন দেখলেন শোলাঙ্কি-রাজবাড়ি জনশূন্য, নিস্তব্ধ অন্ধকার হয়ে পড়ে আছে— সে রাজকুমারীও নেই সে সখীও নেই, তখন বাপ্পার মন একেবারে ভেঙে গেল, তিনি শান্তিহারা পাগলের মতো সেই দিগ্বিজয়ী সৈন্য নিয়ে শান্তির আশায় এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; চিতোরের প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, শূন্য সিংহাসন আর অন্দরে একা মহারানীকে নিয়ে পড়ে রইল।

এই রকম দেশ-বিদেশে ঘুরতে-ঘুরতে বাপ্পা একদিন বল্লভীপুরে গায়নীনগরে— যেখানে দুটি ভাই-বোন গায়েব-গায়েবী পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হলেন। একদিন ষোল বৎসর বয়সে রাজা মানের সেনাপতি হয়ে বাপ্পা মুসলমান সুলতান সেলিমের সমস্ত সৈন্য এই গায়নী-নগর

Scanned with CamScanner

থেকে তাড়িয়ে দিয়ে চিতোর ফিরে গিয়েছিলেন; আজ কত বৎসর পরে যখন কালো চুলে পাক ধরেছে, যখন চোখের কোলে কালি পড়েছে, গায়ের মাংস লোল হয়ে এসেছে, পৃথিবী যখন তাঁর কাছে অনেকটা পুরোনো হয়ে এসেছে সেই সময় বাপ্পা আর একবার সেই গায়নী-নগরে ফিরে এলেন। গায়নী-নগর দেখে বাপ্পার সেই দুটি ভাই-বোন গায়েব-গায়েবীর গল্প মনে পড়ল।

বাপ্পাদিত্য সেই সূর্যকুণ্ডের জলে সূর্য-পূজা করে গায়নীর রাজপ্রাসাদে শ্বেতপাথরের শয়ন-মন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। হঠাৎ অর্ধেক রাত্রে কার একটি মধুর গান শুনতে-শুনতে বাপ্পা ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শয়নমন্দির থেকে পাথরের ছাদে বেরিয়ে দাঁড়ালেন। সম্মুখে মুসলমানদের প্রকাণ্ড মসজিদ জ্যোৎস্নার আলোয় ধপধপ করছে। আকাশে আধখানি চাঁদ; চারিদিক নিশুতি। বাপ্পা জ্যোৎস্নার আলোয় দাঁড়িয়ে গান শুনতে লাগলেন। তাঁর মনে হল, এ গান যেন কোথায় শুনেছেন! হঠাৎ দক্ষিণের হাওয়ায় গানের কথা আরো স্পষ্ট হয়ে বাপ্পার কানের কাছে ভেসে এল; বাপ্পা চমকে উঠে শুনলেন— 'আজ কী আনন্দ! ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ!'— এ যে সেই গান! নগেন্দ্রনগরে রাজপুত-রাজকুমারীর ঝুলন গান!

বাপ্পা ছাদের উপর ঝুকে দাঁড়ালেন; নিচে দেখলেন এক ভিখারিণী রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাইছে— 'আজ কী আনন্দ!' বাপ্পা তৎক্ষণাৎ সেই ভিখারিণীকে ডেকে পাঠালেন। সেই চাঁদের আলোয় নির্জন শ্বেতপাথরের ছাদে পথের ভিখারিণী রাজ্যেশ্বর বাপ্পার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। বাপ্পা জিজ্ঞাসা করলেন— 'কে তুমি? তুমি কি নগেন্দ্রনগরের শোলাঙ্কি— রাজকুমারী? তুমি কি কখনো ঝুলনপূর্ণিমায় এক রাখাল-বালককে বিয়ে করেছিলে?' ভিখারিণী অনেক্ষণ একদৃষ্টে বাপ্পার মুখের

Scanned with CamScanner

দিকে চেয়ে রইল, তারপর একটুখানি হেসে বললে— 'মহারাজ, অর্ধেক রাত্রে ভিখারিণীকে ডেকে এ কী তামাশা!' বাপ্পা বললেন— 'তবে কি তুমি রাজকুমারী নও?' ভিখারিণী নিঃশ্বাস ফেলে বললে— 'আমি একদিন রাজকুমারী ছিলাম বটে, আজ ভিখারিণী। মহারাজ আমি মুসলমান নবাব সেলিমের কন্যা! একদিন পনেরো বৎসর বয়সে তুমি আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলে, সেদিন আমি এই রাজপ্রাসাদের এই ছাদের উপর থেকে তোমায় দেখেছিলাম— কী সুন্দর মুখ, কী প্রকাণ্ড শরীর। আর আজ তোমায় কী দেখছি! সে শরীর নেই, সে হাসি নেই। এমন দশা তোমার কে করল? কোন রাজপুত-কুমারীর আশায় তুমি পাগলের মতো দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ?' বাপ্পা বললেন— 'সে কথা থাক; তুমি আবার সেই গান গাও।' ভিখারিণী গাইতে লাগল— 'আজ কী আনন্দ! ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ।' বাপ্পা সমস্ত দুঃখ ভুলে সেই ভিখারিণীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। গান শেষ হল, বাপ্পা বললেন— 'নবাবজাদী তোমায় কী দেব বল!' ভিখারিণী বললে— 'আমার যদি রাজ্য থাকত তবে তোমায় বলতেম আমায় বিয়ে করে তোমার বেগম কর— কিন্তু সে আশা এখন নেই, এখন আমি ভিখারিণী যে! আমাকে তোমার বাঁদী করে কাছে কাছে রাখ!' বাপ্পা বললেন— 'তুমি বাঁদী হবার যোগ্য নও, আমি তোমায় বেগম করব, তুমি চিরদিন আমার কাছে বসে এই গান গাইবে।'

তার পরদিন সেই মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করে বাপ্পা খোরাসান দেশে চলে গেলেন। সেখানে গুলবাগে খাসমহলে গোলাবের ফোয়ারার ধারে সিরাজির পেয়ালা হাতে বেগম-সাহেবার মুখে আরবী গজল আর সেই হিন্দুস্থানের ঝুলন-

Scanned with CamScanner

গান শুনতে-শুনতে বাপ্পা প্রাণের আরাম, মনের শান্তি পেয়েছিলেন কিনা কে জানে!

একশত বৎসর বয়সে বাপ্পার মৃত্যু হল। পূর্বদিকে— হিন্দুস্থানে তাঁর হিন্দু মহিষী, হিন্দু প্রজারা; পশ্চিমে ইরানীস্থানে তাঁর মুসলমানী বেগম আর পাঠানের দল, হিন্দুরা তাদের মহারাজকে চিতায় তুলে দিতে চাইলে, আর নৌসেরা পাঠানের দল তাঁকে মুসলমানের কবর দিতে ব্যস্ত হলো। শেষে যখন একপিঠে সূর্যের স্তব আর একপিঠে আল্লার দোয়া লেখা প্রকাণ্ড কিংখাবের চাদর বাপ্পার ওপর থেকে খুলে নেওয়া হল, তখন সেখানে আর কিছুই দেখা গেল না— কেবল রাশি-রাশি পদ্মফুল আর গোলাপফুল। চিতোরের মহারানী সেই পদ্মফুল বাণমাতাজীর মন্দিরে মানস-সরোবরের জলে রেখে দিলেন। ইরানী বেগম একটি গোলাপফুল শখের গুলবাগে খাসমহলের মাঝে গোলাপ জলের ফোয়ারার ধারে পুঁতে দিলেন; আর সেইদিন হিন্দুস্থান ও ইরানীস্থানের মধ্যস্থলে হিন্দুকুশ পর্বতের শিখরে হীরে-জহরতে মোড়া এক রাজার শরীর চিতার উপরে তুলে দিয়ে এক সন্ন্যাসিনী বললেন— 'সখী, তোরা সেই গান গা।' চারিদিকে চার সন্ন্যাসিনী ঘিরে-ঘিরে গাইতে লাগল— 'আজ কী আনন্দ।'

সন্ন্যাসিনী সেই শোলাঙ্কি-রাজকুমারী; আর সেই রাজদেহ বাপ্পার মৃতদেহ— দুজনে চিরদিন দুজনের সন্ধানে ফিরেছিলেন, কিন্তু ইহলোকে মিলন হয়নি।

Scanned with CamScanner